আমার ইস্তাম্বুল

শাকিল রেজা ইফতি

ঐতিহ্য

উৎসর্গ

কামরুন নাহার

সেদিন বাংলা ক্যালেন্ডারে শ্রাবণের ২৫ তারিখ। ঢাকায় অঝোর বৃষ্টি, ফেসবুকের ফিডে রীতিমতো চলছিল বর্ষা উৎসব-গান, ছবি, স্মৃতিকথা ইত্যাদির ছড়াছড়ি। ইস্তাম্বুলে বৃষ্টি ছিল না, তবে গ্রীষ্মকালীন এমন দমকা শীতল হাওয়া চোখে পড়ে না সচরাচর। ঢাকার বৃষ্টিস্নাত হাওয়া এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসেছিল হয়তো! আপনি যেমন এসেছিলেন আমার ইস্তাম্বুলের 'থাকব না এখানে, চলে যাব'-মুখর দিনগুলোতে। ওইটুকু শান্তির বরিষণ না থাকলে আমারও থাকা হতো না এই কনস্টান্টিনোপলে।

অতঃপর শ্রাবণের সেই ২৫ তারিখ আপনি অশ্রুসিক্ত বিদায় জানালেন, সেদিন কতকাল বাদে মনে পড়ল: সব ফুরিয়ে যাচ্ছে– সময়, স্মৃতি, শক্তি, স্মৃতিশক্তি– সব! ইস্তাম্বুলে আমাকে এভাবে একা রেখে চলে যাবেন, ভাবতে পারিনি। কল্পনা করি, উজবেকিস্তানের তাশখন্দ শহরটা আপনার রান্না করা বিরিয়ানির গন্ধে মেতে উঠছে সে কী আনন্দে! তাই দূর থেকে ইস্তাম্বুলের খুব হিংসে, অভিমান!

আপনি আমাকে যেভাবে বিদায় জানালেন, একদিন হয়তো ইস্তাম্বুলকে ঠিক সেভাবে বিদায় জানাব আমি। সেদিন আমার খুব কষ্ট হবে। আমি অশ্রুসিক্ত লিখতে পারি না। তাই এখনই লিখে রাখছি আমার ইস্তাম্বুলের স্মৃতিকথা; সীমানার মাঝে যতটুকু সম্ভব– দেখি উড়তে পারি কি না!

লেখকের নিবেদন

অগ্রজ বন্ধুপ্রতিম কবি পিয়াস মজিদ যদি না বলতেন, হয়তো কখনো লেখা হয়ে উঠত না এই গ্রন্থটি। কবির প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি।

ইস্তাম্বুল সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা ছিল না পাঁচ বছর আগেও। উচ্চমাধ্যমিক শেষে বিদেশে পড়তে যেতে চেয়েছিলাম। আর তাই হন্যে হয়ে এখানে-ওখানে আবেদন করেই চলেছিলাম। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে বেশ ভালো বৃত্তিসহ যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো। তবু কেন যেন মন টানছিল না। এর পেছনে অবশ্য একটি কারণকে আমি দায়ী করে থাকি। শৈশবে এক শুভাকাঙ্ক্ষী আমার হাতের রেখা পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, বিশের কোঠায় আমার অবস্থান হবে ভূমধ্যসাগর-সংলগ্ন কোনো শহরে, ইউরোপের আশপাশে। সচেতন আমি ভুলে গেলেও অবচেতন আমি সেই মন্তব্যকে বেশ ভালোভাবেই ধারণ করেছিলাম হয়তো। তুরস্ক সরকারের বৃত্তি সম্পর্কে আগে কখনো শুনিনি। হঠাৎ সামনে এল। ভাবলাম আবেদন করে ফেলা যাক। অতঃপর নির্বাচিত হলাম। অচেনা গন্তব্যে পা বাড়ালাম।

ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাচ্ছি শুনে সেন্ট যোসেফ কলেজের প্রিয় শিক্ষক উন্মেষ স্যার আমাকে উপহার দিলেন সাহিত্যে নোবেলজয়ী তুর্কি লেখক ওরহান পামুকের 'ইস্তাম্বুল : একটি শহরের স্মৃতিচারণা' গ্রন্থটি। কিছুদূর পড়ে মনে হলো, থাক, আর পড়াটা ঠিক হবে না। আমার ইস্তাম্বুলের স্মৃতিকে প্রভাবিত হতে দেওয়াটা অনুচিত হবে। পরবর্তী সময়ে ইস্তাম্বুলবিষয়ক সমস্ত গ্রন্থ থেকে নিজেকে দূরে রেখেছি। স্নাতকের থিসিসের কাজে শুধু রামনাথ বিশ্বাসের 'তরুণ তুর্কি' পড়তে হয়েছিল। আর কিছুই সেভাবে পড়িনি। ইস্তাম্বুলকে আবিষ্কার করার চেষ্টা করে গেছি একান্ত নিজের শব্দে, অনুভূতিতে, কল্পনায়, বাস্তবে। অবশ্য প্রিয় তুর্কি কবি ওজদেমির আসাফ-সহ অন্য তুর্কি সাহিত্যিকদের বিভিন্ন লেখায় ইস্তাম্বুলের প্রতিচ্ছবি আমায় সামান্য কিছু প্রভাবিত করেছে বললে ভুল হবে না। সঙ্গে এটাও স্বীকার করে নিতে হবে, আমি খুব সহজেই ভুলে যাই। শৈশবে সংগীতের ক্লাসে আমার তাল কাটত না মোটেও। তবলা বাজানোতেও মন্দ ছিলাম না। তবু জীবনযাপনের তালজ্ঞান আমার নেই বললেই চলে। আমার মস্তিষ্ক ভাঙলে জ্ঞানবুদ্ধির দেখা মিলবে

না খুব একটা। অবশ্য এতে আমি খুশিই বেশ। জ্ঞানদূষণ-মুক্ত মস্তিষ্ক তুলোর মতো হালকা, বয়ে বেড়াতে আমার কোনো কষ্টই হয় না।

এই গ্রন্থে আমার পাঁচ বছরের ইস্তাম্বুল-জীবনের কিছু মুহূর্তকে কখনো গদ্যে, কখনো পদ্যে, কখনোবা স্বপ্নের ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। জেগে থেকে ইস্তাম্বুলের যা কিছু দেখেছি, তার পাশাপাশি এই শহরে ঘুমিয়ে দেখা স্বপ্নগুলোর কদর না করলে এই স্মৃতিকথা অপূর্ণ থেকে যেত। বিশেষ করে এই পাঁচ বছরের প্রায় অর্ধাংশ আমাকে চলৎশক্তিহীন জীবন যাপন করতে হয়েছে, এখনো তা-ই। হুইলচেয়ারে করে ঘুরে বেড়ানোর সুযোগ ইদানীং আর খুব একটা হয় না। তাই লুসিড ড্রিমিং অনেকটা ভরসা।

যাহোক, প্রিয় পাঠক, এই গ্রন্থটি পাঠের জন্য কিছুটা সময় বের করেছেন, তাই অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। কত দিন আর এ জীবন! এর মাঝে আপনার এই সামান্যটুকু সময় খুব সুন্দর, উপভোগ্য হয়ে উঠুক, সেই কামনায়, প্রার্থনায়–

শারেই
shakilreja144@gmail.com

সূচি

তথাকথিত ১১
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু ১৩
ইস্তাম্বুলে লাল-সবুজ ২৭
তুর্কি শরীরে বাংলাদেশি আত্মা ৩১
যা হারিয়ে যায় ৪৬
জানি হারিয়ে যায়, তবু ৫৪
বঞ্চনাগীতি ৬১
মৌসুমীদি, এই যে, লিখে ফেললাম! ৬২
স্টিভের পিয়ানোতে গমগম চার্চ ৬৪
রুমির ছায়ায় এক অপরাহ্নে ৬৯
যত্রতত্র ছড়িয়ে লেখা জীবন ৭৬
যত্রতত্র ঘুমিয়ে থাকে স্বপ্ন ৯৯
লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশন ১০৬

তথাকথিত

পাশের বাড়ির একটি ব্যালকনিতে হরেক রকমের ফুল, পাতাবাহার। সেখান থেকেই পড়ে গেছে একটি টব। স্থান পেয়েছে প্রকাণ্ড এক দেয়ালের শীর্ষে। দাঁড়িয়ে নেই, শুয়ে আছে। সেই টবের ফুলগাছটা এখনো বেঁচে আছে। আমার ঘরের জানালার পাশের দৃশ্য এটি। প্রতিদিন দেখি একটু একটু করে বড় হচ্ছে গাছটা। আমি ছাড়া ওকে বোধ হয় আর কেউ দেখতে পায় না। মাঝেমধ্যে ভেতরটা হু হু করে ওঠে। জল, যত্ন, রবির কিরণ সবটা থেকে বঞ্চিত, তবু বেঁচেবর্তে আছে। ও গাছ আর আমি মানুষ। তবু আমাদের বিশেষণ একই। আমরা বঞ্চিত, তথাকথিত স্বাভাবিকতা থেকে।

এই তো কদিন আগে ১১ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের মেডিকেল বোর্ড আমার বর্তমান শারীরিক অবস্থাকে একটি নাম দিল। সেদিন ফেসবুক স্ট্যাটাসে লিখলাম :

আজকের দিনটি আমার জন্য বিশেষ। কারণ, আজ তুরস্ক সরকারের স্বাস্থ্য কমিটি আমাকে 'বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন'/ 'প্রতিবন্ধী'/ 'ডিজঅ্যাবল্ড'/ 'ডিফ্রেন্টলি অ্যাবল্ড'/ 'এংগ্যাল্লি' (what's in a name!) হিসেবে ডিক্লেয়ার করে একটি রিপোর্ট দিয়েছে। পারসেন্টেজ হিসেবে আমি ৯০ ভাগ ডিজঅ্যাবল্ড। ৮০ শতাংশের ওপরে যারা, তাদের এ গ্রেড প্রতিবন্ধী বলা হয়ে থাকে। সে হিসেবে 'আই ডিড আ গ্রেট জব'!

প্রায় দুই বছর আগে আমার হাড়ের যক্ষ্মার কারণে তিনটি বড় রকমের অস্ত্রোপচার হয়। মেরুদণ্ডে ১৪টি মেটাল প্লেট প্রতিস্থাপন করা হয়। তার পর থেকে আমি পুরোপুরিভাবে চলৎশক্তিহীন হয়ে পড়ি। দীর্ঘ সময় হাসপাতালে আমার ফিজিওথেরাপি চালানো হয়। পাশাপাশি পুনর্বাসনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। আপাতত আমি বসতে পারি, সিটিং ব্যালেন্স আছে, সঙ্গে আমি হুইলচেয়ারের একজন সাবলীল এবং নিয়মিত ব্যবহারকারী।

আজ থেকে অফিশিয়ালি আমি একজন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন মানুষ। একটি উদ্‌যাপন হতেই পারে, কী বলেন?

এমত উল্লাসে, হে ফিনিক্স, চলো ডুব দিই রবির কিরণে :

‘আমারে তুমি অশেষ করেছ, এমনি লীলা তব,
ফুরায়ে ফেলে আবার ভরেছ জীবন নব নব ।।’

দূরকে করিলে নিকট বন্ধু

ইস্তাম্বুলের আতাতুর্ক আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর তখনো অকেজো হয়নি। ছোট্ট, সুন্দর, পুরাতন। বাংলাদেশ থেকে আমার টার্কিশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইট এই বিমানবন্দরেই এসে নামল। আকাশ থেকেই দেখছিলাম ইস্তাম্বুল। প্রথম যা মাথায় এল তা হলো, সব বাড়ির ছাদ একই রঙের। শহরের মানুষগুলো তো বেশ ইউনাইটেড! তা না হলে একই রঙের ছাদ, কী করে সম্ভব! ভালো লেগেছিল। আমার হাতের রেখার মতোই মর্মর সাগরের শরীর ঘেঁষে ইস্তাম্বুলের প্যাঁচানো সুন্দর অবয়ব, কত হাজার বছরের সভ্যতা শহরটিকে জড়িয়ে রেখেছে! যুগ যুগ ধরে কত অজস্র মানুষের আসা-যাওয়া এখানে! নজরুলের কথা মনে পড়ছিল বিশেষ করে। তুর্কি সংস্কৃতির অন্ধভক্ত ছিলেন। 'কামাল পাশা' কবিতার মতো করে আতাতুর্ককে নিয়ে এমন গগনবিদারী কাব্য যিনি সৃষ্টি করলেন, তিনি খোদ তুর্কি নন, একজন আপাদমস্তক বাঙালি! আমার জানামতে, নজরুল কখনো তুরস্কে আসেননি। তবু তাঁর সাহিত্যে তুরস্কের প্রভাব আমাকে খুব অবাক করে। 'তুর্ক মহিলার ঘোমটা খোলা' প্রবন্ধটিতে নজরুল কী অবলীলায় তুর্কি মেয়েদের বিশ্বসুন্দরী বলে দাবি করলেন! কেন করলেন কে জানে! নজরুল যখন এই প্রবন্ধ লিখছিলেন, তখনো তো তুর্কি মেয়েরা ঘোমটার আড়ালে।

পৃথিবীর সব মেয়েই সুন্দর, মানুষমাত্রই সুন্দর। সে ভিন্ন বিষয়, তবে তুর্কি মেয়েদের বিশেষভাবে আলাদা কাতারে ফেলার ব্যাপারে আমার দ্বিমত আছে। এটা একান্তই আমার ব্যক্তিগত মতামত। এ নিয়ে মোটেও কোনো প্রকারের বিতর্কে জড়াতে চাই না। অবশ্য হ্যাঁ, এসব কথা তো শুরুর সময়ের। কালের পরিক্রমায় এমনকি বিশ্ব পাল্টে যায়, আমার মন তো এই জগতের অতি নগণ্য এক উপাদান।

বিদেশি শিক্ষার্থীদের বৃত্তির বিষয়টা তুরস্ক সরকারের একটি অধিদপ্তর দেখে থাকে, নাম ইয়েতেবে। এয়ারপোর্টে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন সেখানকার একজন প্রতিনিধি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবে হবে করছে। ইস্তাম্বুলে সূর্যাস্ত, আর আমার ইস্তাম্বুল-জীবনের সূর্যোদয়। ইয়েতেবে প্রতিনিধি আমাকে নিয়ে সোজা রওনা দিলেন ডরমিটরির উদ্দেশ্যে। পাহাড় কেটে শহর, কেমন আঁকাবাঁকা! তবু খুব দ্রুতবেগে চলছে গাড়িটি। আমি এমন রাস্তায় মোটেও অভ্যস্ত নই। পাহাড়ি এলাকা বলতে দার্জিলিং আর রাঙামাটি গিয়েছিলাম আগে। তবে এখানকার পাহাড়ের ধরনটা বেশ আলাদা। কোনো একটি পাহাড়ের কিছু উঁচুতে উঠলে আশপাশের পাহাড়গুলোর গায়ে তারার মতো মিটিমিটি করতে থাকা ঘরবাড়িগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকতে দারুণ লাগে। দার্জিলিংয়েও এমন দৃশ্য চোখে পড়েছিল। ওখানে যে হোটেলটিতে আমি ছিলাম, তার স্বচ্ছ কাচের দেয়ালের ওপারে যত দূর চোখ যেত, তরঙ্গের মতো পাহাড় ওঠে, পাহাড় মিলিয়ে যায়। আর পাহাড়গুলোর শরীরে জোনাকির মতো অজস্র ঘরবাড়ি। আমার মতো সমতলের মানুষের চোখে সেই দৃশ্য বিস্ময় বৈকি!

দার্জিলিংয়ের সেই দু-চার দিনের সফরে আমি শুধু অপেক্ষা করতাম কখন রাত গভীর হবে, আর আমি ঘরের এক কোণে কাচের দেয়ালের পর্দা সরিয়ে গোগ্রাসে গিলতে থাকব দার্জিলিংয়ের উলঙ্গ শরীর। গান শুনব রবীন্দ্রনাথ, সুমন, মৌসুমী ভৌমিক। গায়ের পোশাক ছুড়ে ফেলে, একটুকরো কাশ্মীরি শাল জড়িয়ে চায়ের চুমুকে ঝিরিঝিরি বৃষ্টিস্নাত আমার এক পেয়ালা জীবন। সে এক ব্যাখ্যাহীন শিহরণ!

ইস্তাম্বুলে এসে একই রকম দার্জিলিং-বিউটির সাক্ষাৎ পাব, ভাবতে পারিনি। ডরমিটরির ঘরটিতেও কাচের জানালার ওপারে সেই দৃশ্য। যদিও এটা সেই হোটেলঘরের মতো আমার ব্যক্তিগত ঘর নয়। আরো পাঁচজনের বসবাস এখানে। পৃথিবীর পাঁচটি ভিন্ন দেশ থেকে এসেছে ওরা। প্রত্যেকের টাইম জোন আলাদা। তাই পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময়ও আলাদা। ভাষা আলাদা। ঘুমের ঘোরে মাতৃভাষায় কথা বলে উঠত একজন, যার কিছুই আমি বুঝতাম না, শুধু শুনতাম। নিয়মিত প্রায়। ওর নাম এমেরি। রোয়ান্ডা থেকে এসেছে। এমেরি তুরস্কে আমার প্রথম বন্ধু। দেশে থাকতেই ডরমিটরির অনলাইন গ্রুপে পরিচয় হয়েছিল। তখনই বলেছিলাম ওকে যেন ওর ঘরে আমার জন্য একটি সিট বরাদ্দ করে রাখে। তা-ই করেছিল। ঘরে অন্য যারা ছিল, প্রত্যেকেই বেশ সামাজিক কিসিমের– গল্প করতে চায়, জানতে চায়। একেকজনের একেক প্রকার অভ্যাস, বদভ্যাস। এই যেমন আলবেনিয়ার

এরিক টানা তিন-চার দিন জেগে থাকত অনেক সময়। এরপর যখন ঘুমাত, প্রায় দুই-তিন দিন ওর সাড়া পাওয়া যেত না। ওর খাবারদাবারেরও কোনো ঠিক ছিল না। ডাইনিংরুমে ওকে কখনো যেতে দেখিনি।

অবশ্য ডাইনিংরুমের প্রতি আমারও বিরক্তি তৈরি হতে বেশি দিন সময় লাগেনি। তুর্কি মুখরোচক খাবারের কতশত বিজ্ঞাপন চোখে পড়ত, কিন্তু আদতে তুর্কি খাবারে মসলার স্বল্পতা, পরিমাণের কার্পণ্য ইত্যাদি দেখে হতাশ হয়েছিলাম। পরবর্তী সময়ে আমার এক তুর্কি সহপাঠীর বাসায় যখন দাওয়াত পেলাম, তখন মিলল সত্যিকারের তুর্কি খাবারের স্বাদ। ডরমিটরিতে যেটা পেতাম, সেটা তুর্কি খাবারের অপমান বৈকি! পাঁচ বছরে মাত্র দুবার ওদের বাসায় দাওয়াত পেয়েছিলাম। প্রতিবারই খাবার খাওয়া শুরু হয়েছিল স্যুপ দিয়ে। তারপর সবুজ ও কালো রঙের জলপাই, শসা, টমেটোসহ আরো কত কিছুর মিশেলে স্বাস্থ্যসম্মত সালাদ। অল্প খেয়েই পেট ভরে যায়, এমন তৈলাক্ত পোলাও। আর বেগুন ও মাংসের অদ্ভুত মিশেলে অতি সুস্বাদু খাবার ইত্যাদি। বেগুনকে তুর্কি ভাষায় বলা হয় 'পাতলিজান'। বেগুন সত্যিই যেন ওদের 'জান', অর্থাৎ 'জীবন'। এখানে বেগুনের দাম যেমন বেশি, তেমনি খাবারের মেনুতে বেগুন নিয়ে তুর্কিদের অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি আমাকে অবাক করে। আরো যেটা অবাক করে, সেটা হলো ওদের মেনুতে মাছের অনুপস্থিতি। তুর্কিরা ভূমধ্যসাগর, কৃষ্ণসাগর– এত কিছু পেল, অথচ বাঙালিদের মতো মাছ খাওয়ার অভ্যাসটা পেল না। যাহোক, ওদের খাবারের ধরন ও বৈচিত্র্য একেক অঞ্চলে একেক রকমের হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে অন্যান্য শহর ভ্রমণের সময় সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি এবং ডরমিটরির খাবার যে অত্যন্ত নিম্নমানের এবং তুর্কি খাবার নামের কলঙ্ক, সে বিশ্বাসও সুদৃঢ় হয়েছে। নববিবাহিতের মধুচন্দ্রিমা-আনন্দ উপভোগ করছিলাম ইস্তাম্বুলের প্রথম দিনগুলোতে। আবার দাম্পত্য জীবনের মতোই যেন ধীরে ধীরে চলে আসছিল একরকম অভ্যস্ততা, প্রথম দিনগুলোর সেই উত্তেজনার জায়গা ক্রমশই দখল করে নিচ্ছিল একপ্রকার কালারলেস রসকষহীনতা।

'শোনো, তুর্কি গার্লফ্রেন্ড বানিয়ে নাও। ভাষাটা খুব দ্রুত শিখে নিতে পারবে!' বলেই একদিন হো হো করে হেসে উঠল আমার স্প্যানিশ ক্লাসমেট কার্লোস। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পিএইচডি করতে এসেছে সে। আমরা যারা সরকারি স্কলারশিপ নিয়ে এসেছি, সবাইকে প্রথম ১০ মাসের মতো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তুর্কি ভাষা শেখানো হয়। এই ভাষা শেখার সময়টা খুব মজার অবশ্য। বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যাচেলরস, মাস্টার্স ও পিএইচডি করতে আসা সবার ভাষার ক্লাস একসঙ্গে হয়। আমার ক্লাসে ছিল ২০ জন শিক্ষার্থী,